সম্পাদকীয়

প্রতীতি
ইসলামপুর, মঙ্গলবার, ২১ ফেব্রুয়ারি,০৬, ৯ই ফাল্গুন, ১৪১২

সাহিত্য শাশ্বত সৌন্দর্য্যের উৎস। যা কিছু চিরন্তন ও মহৎ তাই সাহিত্যের অবলম্বন। সাহিত্যের বিচিত্র অনুভূতি থেকে যে সমাজ বঞ্চিত সে সমাজ অপরিণত সমাজ। আমাদের সমাজের চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা যদি ক্ষুদ্র হয় তবে সে সমাজের পক্ষে বড় কিছু আশা করা যায় না। সাহিত্য হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম যা সমাজের মানুষের মূল্যবোধকে জাগ্রত করে তুলতে পারে। অজানাকে জানার আগ্রহ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নিত্য নতুন জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চল, অপার সমুদ্র ও মহাশূন্যেও বিচরণ করে চলেছে। তারা অর্জন করছে নিত্য নতুন জ্ঞান। যুগ যুগ ধরে জ্ঞানী-গুণী-মনীষী ও সাহিত্যিকগণ তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সুখ-দুঃখকে বইয়ের পাতায় সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মূল্যবান পথ প্রদর্শক হিসেবে রেখে গেছেন। মহাকালের স্রোতধারায় অজস্র জ্ঞান পিপাসু ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তারা জ্ঞানের সুধার সন্ধার পেয়ে সেই ভান্ডারে ঝাঁপিয়ে পড়েন নির্দ্বিধায়। সেই জ্ঞানের অমিতধারা পরবর্তীদের জন্য সাহিত্যের পাতায় সংরক্ষিত থাকে বছরের পর বছর ধরে।

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। সে দিনটি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সারাদেশে আন্দোলনের দিবস। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ধারাকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সরকার ঐ দিন ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমিতি-মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বাংলার দামাল ছেলেরা এ দমনমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায়। মিছিলটি বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাছে এলে পুলিশ নির্মম গুলি চালায়। ফলে মুহূর্তেই ঝরে পড়ে রফিক, ছালাম, বরকত, জব্বার, শফিউর সহ কত নাম না জানা তাজা প্রাণ। তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার পিচঢালা রাজপথ। সৃষ্টি হয় এক নতুন ইতিহাস।

শঠতার রাজনীতি, দালালিচক্রের সংস্কৃতি পরায়ণ মনোভাব একুশের চেতনাকে ম্-ান করে দিচ্ছে। সাহিত্য মানুষের চিন্তা-চেতনা, কল্পনা থেকে উদ্ভুত কল্যাণ ও আনন্দ সঞ্চারী বাণী-বিশ্বাস। ভাব-ভাষার অনুষঙ্গী হয়ে বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ ঘটিয়ে রসময় অনুভূতির জন্ম দিলেই তা সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠে।

ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করা না গেলে সাহিত্যের গতিপথ হয়ে পরত মন্থর, সৃষ্টির প্রেরণা যেত স্তব্ধ হয়ে। আপোষহীন সংগ্রামী চেতনা সাহিত্যের ভেতর দিয়েই জাতীয় জাগরণ হয়ে উঠে ত্বরান্বিত।

অন্ধ বিশ্বাস অজ্ঞ আচারের চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের বাংলা সাহিত্য চেতনার স্রোতধারা। আমাদের দেশের গুটিকতক শিক্ষিত মানুষ শিক্ষা জীবন শেষে জীবিকার দাসত্ব করে। তারা সাহিত্য চর্চার চেয়ে রুটি রোজগারের পথকে মসৃণ মনে করে। ফলে আমরা যে তিমিরে আছি, সে তিমিরেই থেকে যাচ্ছি যুগ যুগ ধরে। তবুও কিছু কিছু লোক জীবন-সংগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য চর্চা করে।

বাংলা সাহিত্যের অপরিহার্যতা নিছক ভাব-বিলাসী কল্পকথা নয়। নজরুলের 'বিদ্রোহ' কবিতা যেদিন বৃটিশ লুটেরাদের মনে প্রাণে অগ্নিবলয় সৃষ্টি করেছিল ঠিক সেদিন হতেই বাংলা কবিতা হয়ে উঠেছিল বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খল মুক্তির আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং বাঙালি জাতি সত্তার মৌলস্বরূপের একক প্রতীতি।

অপ্রকাশিত স্বপ

অনাহারে চাকুরীর জন্য ভোরে বেরিয়ে গেছে অথচ সকাল গড়িয়ে দুপুর গড়িয়ে রাত্রির উদয় হচ্ছে এখনও আসছে না। রফিক সাহেব বয়সে প্রবীন হলেও কথায়, কাজে তার চেহারায় এখনও যথেষ্ট লাবন্যতা ও নবীনের প্রভাব বিদ্যমান।

বাসায় প্রবেশ করা মাত্রই বাড়ীওয়ালার কড়া কড়া কথা শুনতে পেল। এ মাসের মধ্যে সব ভাড়া পরিশোধ করতে না পারলে গত মাসের ভাড়ার বদলে ঘরের আসবাবপত্র সহ সব জিনিসপত্র নিয়ে যাবে বলে ঝাঁঝের সাথে বলে বাড়িওয়ালা চলে গেল। রফিক সাহেব শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে বাড়িওয়ালার চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখল। এমন সময় সজীবের মা বলল-ঃ কোন ব্যবস্থা কি হলো ?

-কিছুক্ষণ নিরব থেকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনেকটা হতাশার সুরে উত্তর দিল ঃ না গিন্নি, হলো না।

ঃ তোমার ছাত্রদের অফিসে গেলেও তো পারতে ? তারা আজ বড় বড় অফিসার হয়েছে। নিশ্চয়ই ওরা তোমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবে না ; হাজার হলেও তুমি ওদের শিক্ষক তো ?

খোঁজ নেয়ার কি বাকী রেখেছি ? ভাগ্যে চাকুরী না থাকলে কে দেবে বল ? ঃ ঠিক আছে এখন হাত মুখ ধুয়ে খেতে এসো।

গরম ভাতের সাথে মাছ ভাঁজা দেখে মাস্টারের জিহ্বায় জল এসে গেল। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করল-

ঃ মাছ কোথায় পেলে ?

কোথায় আর পাব, দু'দিন অনাহারে থেকে তোমার ছেলে বড়শি দিয়ে ডোবা থেকে ধরে অর্ধেকটা বিক্রি করে চাল কিনেছে আর বাকীটা বুঝতেই পারছ।

-এ কথা শুনে মাস্টারের মুখ মন্ডল ম্লান হয়ে গেল। মনের অজান্তেই তার দু'চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ভাতের উপর গড়িয়ে পড়ল। সে ভাবল অনাহারে থাকতে না পেরে সজীব আজ মাছ ধরতে গেছে। মাত্র আট বছর বয়স ওর।

এ সময় ছেলেরা লেখাপড়া আর খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে। আর সজীব! খেলাধুলা-লেখাপড়া তো দূরের কথা দু'বেলা ঠিকমত খেতে পায় না। এরূপ ভাবতে ভাবতে খেতে শুরু করল।

বৃষ্টির জলে ভিজে অন্যের বাসায় কাজ করতে করতে ওর মা ভীষণ জ্বরে পড়েছে। আজ ক'দিন হলো জ্বর কমছে না। চিকিৎসা করানোর মত মাস্টার কোন উপায় না দেখে বিদ্যালয় থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কার স্বর্ণের ম্যাডেলটি বিক্রি করতে বাজারে নিয়ে গেল। সেই টাকায় কিছু ঔষধপত্র কিনে বাড়ির ধারে আসতে সজীবের কান্না শুনতে পেয়ে দ্রুত ভিতরে গেল।

কিন্তু হায়! ততক্ষণে সব শেষ। আকস্মিক স্ত্রীর মৃত্যুতে মাস্টার কিছু ভাবতে পারল না।

ম্যাডেলটি বিক্রির টাকায় কয়েকদিন কেটে গেল। শেষে আর উপায় না দেখে মাস্টার সাহেব বস্তির হোটেলে কাজ করতে গেল। তাও জুটল না তার কপালে। বেঁচে থাকার কোন উপায় না পেয়ে নোংরা পৃথিবীকে ধিক্কার জানাতে জানাতে যেইমাত্র মেইন রোডে পা রাখল ; ঠিক সেই সময় পিছন থেকে দ্রুত বেগে ছুটে আসা একটি ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেল। মাথা দিয়ে প্রবল রক্ত ঝরছে।

একটা জলজ্যান্ত মানুষ রাস্তায় পড়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে অথচ কেউ তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না। দু'দিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর মোটামুটি সুস্থ হলেও বিসর্জন দিতে হলো দু'চোখ। অন্ধ হয়ে গেলেন তিনি। বাবার চিকিৎসার জন্য সজীব প্রতিদিন বকুল, শিউলি ফুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে বাসষ্ট্যান্ডে বিক্রি করে। প্রতিদিন কিছু কিছু করে টাকা আলাদা ভাবে সংগ্রহ করে বাবার চোখ অপারেশন করানোর জন্য। সজীবের মালা বিক্রি দিন দিন বেশ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

আজ ফুল কুড়াতে দেরী হওয়ায় বাস ষ্ট্যান্ডে গিয়ে দেখে তার মালা কেনার মত কেউ নেই। সকালের বাস ছেড়ে গেছে মিনিট পাঁচেক আগে। আজ মালা বিক্রি করতে না পারলে না খেয়ে থাকতে হবে ভেবে সজীব কাঁদতে লাগল। এক বৃদ্ধ সব শুনে তাকে একশ টাকা দিতে চাইল কিন্তু বাবার আদর্শের যাত্রী সে তাই কারও করুণা নিতে সম্মত হলো না। বরং সে বলল-

ঃ আমি রাস্তার মোড়ে মালাগুলো বেশ কিক্রি করতে পারব।

তার সততা দেখে বৃদ্ধ বলল

ঃ আমি তো আর তোমাকে এমনিতেই টাকা দিচ্ছি না, বিনিময়ে তোমার মালাগুলো কিনে নিচ্ছি।

ঃ আপনি মালা কিনবেন ? আনন্দে বলে উঠল সজীব।

ঃ দাও মালা গুলো আমাকে দাও। এই বলে মালা গুলো কিনে নিল বৃদ্ধ।

ঃ একি একশ টাকা কেন ? বলে উঠল সজীব।

-বাকী টাকার মালা না হয় কাল দিয়ে যেও।

কাল ঈদ তাই এক সাথে একশ টাকা পেয়ে সজীব আনন্দে নেচে উঠল। একশ টাকা আর নিজের জমানো টাকা দিয়ে বাবার জন্য একটি চশমা কিনে বাড়ির পথে দ্রুত ছুটতে লাগল। কিন্তু নিয়তির কি নির্মম অভিশাপ !

হঠাৎ পেছন থেকে একটি মাইক্রোবাস মুহূর্তেই সজীবকে পাকা রাস্তার সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেল। সজীবের গগন বিদারী চিৎকারে অনেকে ছুটে এল। কিন্তু হায় !

ততক্ষণে সব শেষ। নিষ্ঠুর এ পৃথিবী থেকে অঙ্কুরেই মিশে গেল একটি জীবন একটি স্বপ্ন।

ভাঁজপত্র সমালোচনা

প্রকাশ করাই সাহিত্য। অপ-সংস্কৃতির প্রভাব সাহিত্যে বা সমাজে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুস্থ জীবনবোধ এবং সম্ভাবনাময় সুনাগরিক গড়ার পথে অপ-সংস্কৃতি প্রতিরোধ প্রতিটি সচেতন মানুষেরই কর্তব্য। এ বিষয়টি সুন্দর ভাবে বেরিয়ে এসেছে রাজিবপুর প্রেসকাবের সভাপতি এ.এস ফারুকী সাহেবের লিমেরিক কবিতায়। প্রগতির পথে অজতা-ঔরুতা যে মানুষকে কতটা নিচে নামিয়ে দেয় তার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে সৈকত আহমেদ বিল-াল এর 'বিজয় আসন' কবিতায়। চারটি ভাঁজে বিভক্ত আট পৃষ্ঠার এ 'ভাস্কর' ভাঁজপত্রটির দাম রাখা হয়েছে সকলের অনুকূলে তাও আবার দুই টাকার বেশি নয়। এখানেও সম্পাদক এক অভিনব পদ্ধতিতে সুর ও ছন্দের অবতারনা করেছেন। তিনি লিখেছেন 'ভাস্করের বিনিময় ঃ দুই টাকার বেশি নয়'।

গ্রন্থনা ঃ সৈকত আহমেদ বিল-াল

সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার

ভাষা অত্যন্ত দুর্বল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা চিকিৎসাশাস্ত্র এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত পুস্তকাদি বাংলায় রচনা করা সম্ভব নয়, বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার খুবই সীমিত। কিন্তু তাদের ধারণা অসার প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অফিস-আদালতে, শহর-বন্দরে বাংলা ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার যাবতীয় বই-পুস্তক রচিত হচ্ছে। সুতরাং বাংলার ব্যবহার এখন সর্বজন স্বীকৃত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করতে বলেছেন। কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থী শিক্ষার ভেতর আনন্দ খুঁজে পায়। ফলে তারা কম পরিশ্রমে শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। মাতৃভাষা চর্চা করেই পারস্য একদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে অমূল্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, চীন সব দেশই মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাই আমাদের দেশেরও সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে শিক্ষার মাধ্যম অবশ্যই মাতৃভাষা হতে হবে।

অনেকে বলেন, বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার সীমিত। এতে সব রকম মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় রচিত বইয়ের সংখ্যা সীমিত। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাশাস্ত্র, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা বাংলা ভাষায় আদৌ সম্ভব নয়। এসব সমস্যার সমাধানকল্পে বলা যায়, বাংলা ভাষায় যারা পণ্ডিত তাঁদের বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বইয়ের অনুবাদ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। কোন ভাষারই শব্দ ভাণ্ডার একদিনে সমৃদ্ধ হয়নি। এ জন্য বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আশার কথা হচ্ছে, বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য বাংলা একাডেমী চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ইতোপূর্বে বাংলা ভাষার অভিধান বের করেছে এবং নানা ধরণের বইও প্রকাশ করছে। এভাবেই বাংলা একদিন আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

বাংলা ভাষা যে বিবিধ রতনে পূর্ণ তা আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। এ জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিল্প-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বাংলা ভাষাকে অবহেলা না করে শ্রদ্ধা দেখানো উচিত। তাহলে আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ সুগম হবে, আমরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠব।

এক কিংবদন্তী সাংবাদিক

সকলের প্রিয় ব্যক্তিতে। হাস্যোজ্জ্বল মাঝ বয়সী সেই বকুল আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আছে তার অজস্র স্মৃতি। তিনি একাধারে কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক পাশাপাশি সমাজসেবক। তাঁর অবদান খাঁটো করে দেখার মত নয়। কেননা, তার হৃদয়ের সকল ভালবাসা, স্নেহ আমাদের উজার করে দিয়েছেন। এতটুকুও কার্পন্য করেননি কখনো।

সাংবাদিকতার কোন বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হলেই তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে উঠতেন 'সৎ সাংবাদিকের কোন বন্ধু নেই'। তার অবদানের জন্য উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী কর্তৃক কবি সনদ প্রদান করা হয় ১৯৮৬ সালে। তাঁর 'মনের গহীনে জীবন' ও 'নীলার মেয়ে' ২টি গল্পগ্রন্থ এবং 'ভাবী' ও 'প্রেমের কবিতা' নামে ২টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া তার সম্পাদিত অনেক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর অল্পদিন আগে তিনি নিজ বাড়ির নিকট প্রতিষ্ঠা করেন 'হাফিজ পাঠাগার'। এটা তাঁর দীর্ঘদিনের একটা স্বপ্ন ছিল। তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আজও সেই পাঠাগারটি মরহুম গোলাম হাফিজ বকুলের স্মৃতি বহন করে চলেছে। হাজারও কর্ম ব্যস্ততার মাঝে আজও গোলাম হাফিজ বকুলের স্মৃতি অম্-ান, অবিনশ্বর।

এখানে মোবাইল সেট, টেলিফোন সেট, গ্রামীণ, একটেল, বাংলা লিংক সীম কার্ড, ইজি কার্ড, কভার, ক্যাচিং, ব্যাটারী সহ মোবাইলের সকল প্রকার যন্ত্রাংশ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক সার্ভিস
প্রোঃ এস.এম আরিফুর রহমান আরিফ
দেশ-বিদেশে ফোন-ফ্যাক্স করা হয়
রহমান মার্কেট, স্টেশন রোড, ইসলামপুর, জামালপুর।
মোবাইল-০১৭৩-৫৩৭৮৯৩, ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ০৯৮২৪-৭৪১৬৫।

ইসলাম সমর্থন

হত্যা করা গোটা মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল। মানুষ অপহরণ করে হত্যার হুমকি দিয়ে মুক্তিপন আদায় করা, মুক্তিপন না দিলে হত্যা করা সাধারন হত্যা থেকে আরও জঘন্য।

আল-হতায়ালা নবীগনকে এ দায়িত্ব দেননি যে মানুষকে যেমন করেই হোক হেদায়াত করতে হবে। হেদায়াত করার তেমন ইখতিয়ার নবীগনকে দেয়া হয়নি। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, মানুষকে সত্যের পথে যেন আহ্বান জানাতে থাকেন। মানুষকে বুঝাবার জন্য, তাদের বিবেককে জাগ্রত করার জন্য, সরল-সঠিক পথ চিনাবার জন্য রাসুলগন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছেন। আল-হতায়ালা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি বিবেচনার শক্তি দিয়েছেন। নবীর দাওয়াত গ্রহণ করতে বাধ্য করার কোন শক্তি নবীগনকে দেননি। স্বাধীন ভাবে বিবেচনা করে নবীর দাওয়াতকে গ্রহণ বা বর্জন করার ইখতিয়ার তিনি মানুষকে দিয়েছেন। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অলৌকিক উপায়ে হেদায়াত করে ফেলার কোন নির্দেশ নবীগনকে দেয়া হয়নি ।

কুরআন ও হাদীস এবং ইতিহাস থেকে বিস্তারিত জানা যায়। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পূর্বে ১৩ বছর মক্কায় অবস্থানকালে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার সাথীগন জুলুম ও সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন। কেউ কেউ নির্যাতনে অস্থির হয়ে প্রতিরোধের অনুমতি চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার জন্য হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু সন্ত্রাসের মোকাবেলা সন্ত্রাস দ্বারা করার অনুমতি দেননি। কারণ এ অনুমতি দিলে ইসলামী আন্দোলন যবনিকা টানত। তাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কৌশলময় মোকাবেলা স্বরূপ হিজরতকেই অনুমতি দিয়েছেন।

ইসলামের নামে বোমাবাজি, জিহাদের নামে আল-হর আইন কায়েমের উদ্দেশ্যে যারা মানুষ হত্যার মত নৃশংস ও হিংস্র কাজটি করছে তারা দ্বীন ইসলামকে কলঙ্কিত করে আল-হর লানতের ভাগী হচ্ছে। আত্মঘাতী বোমা হামলা করে যারা জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে তারা মূলত চিরকাল জাহান্নামে থাকারই যোগ্য বিবেচিত হবে।

পরিশেষে বলতে পারি যে, এ সন্ত্রাসবাদী ও বোমাবাজীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ, গণতন্ত্র ও ইসলামের ক্ষতি সাধন করা। আর এরা ইসলাম ও দেশের শত্রুদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদেরই ক্রীড়নকে বোমাবাজির মত এ হীন কার্য চালিয়ে যাচ্ছে।

আধারের রজনী

পবিত্র জল টুপটাপ ভাবে গড়িয়ে ঢেউ অন্তর নামক সন্দিপে।

কলেজ ছাত্রী রজনী। পরেশ দাস জীবিত। স্বাধীনতা দিবসের এক মহোতী অনুষ্ঠানে পরিচয় আধারের সাথে।

তালুকদার বাড়িতে নতুন এসেছে। খুব ভাল ছেলে আধার। দেখতে সুন্দর ব্যবহারের অমায়িক বাড়তি ভাল সাহিত্যমনা। অল্প দিনের মধ্যে আধার দেওয়ানপুর ছাত্র সুধী মহলের মাঝে সুনামের অধিকারী হয়ে উঠে।

দেওয়ানপুর কলেজে ভর্তি হয়ে যায় আধার। কবিতা, গল্পের মাঝে আবিষ্কার করে রজনীকে। কলেজে যাওয়া আসার পথে দেখা হয় দু'জনের। ক্রমে ক্রমে দু'জনের দূরত্ব আয়ত্বে এসে যায়। দু'জনার মাঝে ভাবের অনুভূতি বিনিময় শুরু হয়।

দমকা বাতাস আকাশসম বাঁধার প্রাচীন ভেঙে যায়।

অণু পরমাণুগুলো জমা হতে থাকে নদীতে। নদী সাগরে মোহনার জন্য দ্রুতবেগে চলে যায় সব ভুলে। সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে গেয় আধার আর রজনী।

এমনি ভাবে দু'জনার ভাব যখন একত্র হয়ে যায় একদিন চরণতলা মেলাতে গিয়ে মন্দিরে দেবীর সামনে দু'জনের বিয়ে হয়ে যায় তারপর..... ।

দিনের আলোর মত একদিন উদ্ভাসিত হলো ওদের প্রেমের কাহিনী। মিনি শহরময় ছড়িয়ে পড়লো সে কিরণের তীব্রতা।

ঘটনা-দূর্ঘটনা বিচ্ছিন্ন ভাবে হলো। আধারের আত্মগোপন এবং রজনীর নিরবতার মধ্যেও দু'টো মন এক মোহনায় এখন শীতল জলের অভাবে শুকাচ্ছে। সাগরের মুখে হিমালয় পর্বত !

সুতা ছেঁড়া দু'টি ঘুড়ি আকাশে অনিশ্চয়তার পথে উড়ছে, সবাই জানে অনেকেই দেখেছে কিন্তু কেউ বলতে পারছে না কখন ওদের আবার মিলন হবে।